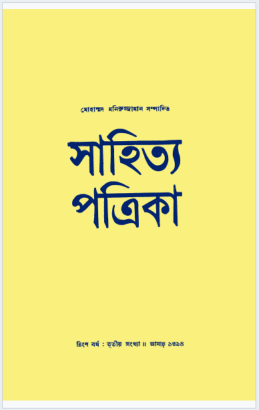

Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.8
Pages	203-208
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা ॥ নরেন বিশ্বাস ॥ বাংলা একাডেমী, ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫ ॥ মূল্য : ৭৫·০০ টাকা ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪০

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে কথা-সাহিত্য ও কাব্য-গ্রন্থ যে-পরিমাণে রচিত হয়েছে, সে-পরিমাণে তথ্যনির্ভর প্রসাদগুণ-সম্পন্ন প্রবন্ধ-গ্রন্থ লিখিত হয়নি। তার কারণ সম্ভবত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে লেখকের অন্তরঙ্গ বোধের অভাব। এ সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক প্রকাশিত গ্রন্থের বস্তুনিষ্ঠ বিষয়, ঋজু ভাষা ও পরিবেশন-ভঙ্গীর অভিনবত্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু' বছর আগে প্রকাশিত অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের 'প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা' গ্রন্থটি বিবিধ কারণে পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এই মন্তব্য করা যায়।

'প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা' গ্রন্থটি বাংলা ভাষা-বিষয়ক বারোটি প্রবন্ধের সংকলন। এর মধ্যে ছ'টা প্রবন্ধ শুদ্ধ ভাষা সম্পর্কিত এবং অবশিষ্ট ছ'টা প্রবন্ধ বাংলা গদ্য, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের ওপর লিখিত। লেখক ভূমিকায় স্পষ্টভাবে রচনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য অনুধাবন সহজ হবে—"বলাবাহুল্য, এ-গ্রন্থের সবগুলো প্রবন্ধের বিষয়-বস্তুই বাঙলা-ভাষা সম্পর্কিত। আমি ভাষাতাত্ত্বিক নই, ফলে এ-গ্রন্থে কোন ভাষাতত্ত্ব-বিশারদ পাঠক যদি ভাষার তাত্ত্বিক গভীর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা অনুপস্থিত দেখে পীড়িত হন, তাহলে আমি নিরুপায়। কারণ তাঁদের জন্যে গ্রন্থ রচনার সাধ এবং সাধ্য দুইই আমার নেই।" লেখকের এই সত্যভাষণ সত্ত্বেও বলা যায় যে, তিনি এই গ্রন্থে ভাষা-বিষয়ক যেসব বস্তুর অবতারণা করেছেন, তা অনেক ভাষাতাত্ত্বিকেরই মৌলিক অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ধরা পড়েনা। তার কারণ, তাঁরা ইংরেজি রেফারেন্স বই সামনে রেখে বাংলা ভাষাতত্ত্বের বই লেখেন, আর অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস বাংলা ভাষাভাষী ও বাংলা সাহিত্য সামনে

রেখে উপলব্ধিগত অনুধ্যানের মাধ্যমে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। এখানেই তাঁর সার্থকতা। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধগুলি কতখানি বিশুদ্ধ---তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তার কারণ, ভাষাতত্ত্ব শুধু তত্ত্ব নয়, জীবন-সংস্কৃতি বিষয়ক উপাধানও।

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুতে যেমন অভিনবত্ব আছে, তেমনি বিশ্লেষণ-ভঙ্গীতে মননশীলতার সঙ্গে হার্দ্য গুণ জড় মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র ইতিবাচক ভঙ্গী পাঠককে সচেতন করে তোলে। তিনি যে-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন সে-বিষয়ের ভেতরে প্রবেশ করে মৌল সত্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। যুক্তি-বাদী বাণীভঙ্গী প্রবন্ধের সর্বত্র প্রাধান্য পাওয়ায় প্রবন্ধগুলি চিন্তাশীল পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য বিষয়রূপে আদৃতযোগ্য।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। লেখকের ভাষা-দর্শ সম্পর্কে উত্থাপিত মতের প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত দিকগুলি উপস্থাপন করা সম্ভব। লেখক বাংলা বানানের সঙ্গে উচ্চারণ-গত অসাম্য দূরীকরণে বিশেষ পক্ষপাতী। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বানান ও উচ্চারণের মধ্যে সৌসাম্য থাকলে ভাষা ব্যবহারে ভাষা-ভাষীর সুবিধে হয়। সম্ভবত, এজন্যেই গ্রন্থে 'বোলে' 'নোতুন' শ্রেণীর বানান ব্যবহৃত। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, অধিকাংশ ভাষাতেই বানান ও উচ্চারণ সমস্থানীয় নয়। তার কারণ, বিভিন্ন সামাজিক কারণে উচ্চারণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিচিত তিনটি বিদেশী শব্দ এখানে উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। শব্দ তিনটির মধ্যে দুটি ইংরেজি put ও but এবং অন্যটি ফরাসী Henry। ইংরেজি দুটো শব্দে উ স্বরধ্বনি থাকলেও উচ্চারণ স্বতন্ত্র---একটায় 'পুট' অন্যটায় 'বাট'। তার কারণ, বর্ণমালায়, অনুল্লেখিত একটা 'উ'র উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ফরাসী শব্দের উচ্চারণ 'অঁরি—হেনরী নয়। বানান ও উচ্চারণে এই শ্রেণীর অসাম্য দূর করা সহজসাধ্য নয়। বাংলায় গরু, সরু, গেল, হল, থেকে শুরু করে অসংখ্য বানানের প্রতিলিপিকরণ তাহলে পরিবর্তনের প্রয়োজন। লেখক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন: স্পষ্টার্থক ধ্বনিকে বলে শব্দ (পৃ. ১)। ড. চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিমত বর্তমানে অগ্রহণযোগ্য। তার কারণ, কোন ধ্বনিই অর্থবহ নয়। তাছাড়া, বাংলাতেও কোন একক অর্থবহ ধ্বনি নেই, যা শব্দ হিসাবে গ্রহণ-

যোগ্য। অর্ধ-তৎসম শব্দকে তিনি 'বিকৃত' বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এখানে 'পরিবর্তিত' শব্দের ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হত। তার কারণ, সংস্কৃত বৈয়াকরণ সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপকে বিরূপভাবে দেখতেন বলে 'বিকৃত' বলে বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছেন। যে-কোন ভাষায় ব্যবহৃত পূর্বকালীন শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। সমকালে ব্যবহৃত শিষ্ট উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটলে অবশ্য তা বিকৃত বলে গ্রহণযোগ্য। বহিরাগত শব্দ সেই ভাষাদর্শ অনুযায়ী উচ্চারিত না হলে তা-ও বিকৃতভাবে গ্রহণ করা যায়। তবে, বাঙালীদের সংস্কৃত উচ্চারণ 'বিকৃত' বলার পেছনে লেখকের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সংস্কৃতে সুশিক্ষিত অধ্যাপকরাও সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণে অভ্যস্ত হলেও এই দিকটি সম্পর্কে তাঁরা একান্তভাবে অসচেতন। 'সন্ধ্যা' 'সূর্য" শ্রেণীর একান্ত পরিচিত শব্দের উচ্চারণ তার সাক্ষ্য। সনধিয়া, সূরইয়া না বলে তাঁরা বাংলা সন্ধ্যা, সূর্য উচ্চারণ করেন। 'বাঙলা ভাষার শব্দ' প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্ববিধ শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা প্রাঞ্জল এবং যুক্তিযুক্ত।

'বাঙলা বানান' প্রবন্ধে বাংলা বানান ও উচ্চারণগত পার্থক্য এবং ধ্বনির অসামঞ্জস্যগত দিক আলোচিত। বাংলা বানান সম্পর্কে লেখক একটি স্পষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষপাতী। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, বাংলা বানানের ধ্বনিগত অসামঞ্জস্যগত দিক সম্পর্কে এর আগেও অনেকে প্রবন্ধে আলোকপাত করেন।

'চলিত বাঙলায় বানান' প্রবন্ধের পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় নির্দেশিত সব শব্দগুলো প্রকৃত নয়। উঠে—ওঠে এই শ্রেণীর পরিবর্তন নির্দেশ করলেও সর্বত্র অভ্রান্ত নয়। তার কারণ, 'উঠে' থেকে সর্বত্র 'ওঠে' পরিবর্তন হয়না। যেমন, 'সে উঠে দাঁড়াল' কিন্তু 'সে সকালে ওঠে।' এখানে 'সে উঠে দাঁড়াল' থেকে 'উঠে' শব্দের পরিবর্তন করে 'ওঠে' প্রয়োগ করলে তা একান্তই আঞ্চলিক দোষযুক্ত হবে।

'চলিত বাঙলার বানান' সম্পর্কে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস বানান সরলী-করণের বিভিন্ন প্রস্তাব উথাপন করেছেন। কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা 'এ' স্বরধ্বনির দুটি

ভিন্নতর উচ্চারণ সম্পর্কে লেখক নির্দেশ করেছেন। যেমন, সেনা ও কেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা এ ও এ্যা দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিরূপে গৃহীত, যদিও দুটি স্বতন্ত্র বর্ণমালা অনুপস্থিত। সংস্কৃত স্বরধ্বনিতে সমশ্রেণীর অসংগতি বর্তমান থাকায় দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃত পণ্ডিতরা এ-ধ্বনির মাথায় ফোটা দিয়ে এ্যা স্বতন্ত্র ধ্বনিরূপে চিহ্নিত করেছেন। বারো সংখ্যক প্রস্তাবে লেখক বাংলা বানানে মহাপ্রাণ ধ্বনি সম্পর্কে বিধি প্রবর্তন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা বাস্তবীকরণে অন্তরায় বিদ্যমান। তার কারণ, বানানে মহাপ্রাণ ধ্বনি ব্যবহারের একটি কারণ সমশ্রেণীর শব্দের দুটি অর্থ-বাচকতা দিক নির্দেশ। যেমন, চল ও ছল শব্দ। ছল শব্দ চল রূপে রূপান্তরিত করলে একটি অর্থ বিলুপ্ত হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলা সব শব্দেরই' শেষ মহাপ্রাণ ধ্বনি যে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়, তা নয়। যেমন, গাধা, বাধা শব্দ। এই শ্রেণীর শব্দের উচ্চারণ সাধারণত অল্পপ্রাণ ধ্বনির সাহায্যে করা হয় না। ত্রয়োদশ প্রস্তাবে লেখক জ ও য সম্পর্কে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা যুক্তিসঙ্গত হলেও বিদেশী শব্দের প্রকৃত উচ্চারণে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। যেমন, Zipper শব্দ। বাঙালীরা এই দশটি 'যিপার' এর পরিবর্তে 'জিপার' উচ্চারণ করায় অর্থ বোধগম্যে অসুবিধা হয়।

'বাঙলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশীয় বাঙালীদের উচ্চারণ-গত অবিশুদ্ধতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা তাঁর সচেতন মানসিকতার পরিচয়বাহী। প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ উদধৃত করা যেতে পারে।

"বস্তুত হাল আমলে আমাদের দেশে বাঙলা-উচ্চারণের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এ ভাষার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।" (পৃ. ৬৪)

"কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে দেশের প্রাথমিক পাঠশালা থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বেশীর ভাগ শিক্ষকের বাঙলা-উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয় (অনেক ক্ষেত্রে ভাষা-বিজ্ঞানের পিএইচ.ডি. শিক্ষকেরও) এবং রেডিও-টেলিভিশনে আমরা হর-হামেশা যে উচ্চারণ শুনি তা-ও অনেকক্ষেত্রে প্রামাণ্য উচ্চারণ-রীতির অনুসারী নয়।" (পৃ. ৬৫)

"বাঙলা ভাষার এবং উচ্চারণের অধোগতির মূল কারণ সম্ভবত মাতৃ-ভাষা সম্পর্কে আমাদের এই সীমাহীন অবহেলা এবং উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গী (অনেক ক্ষেত্রে হীনমন্যতাবোধ)।" (পৃ. ৬৭)

নরেন বিশ্বাসের শেষ মন্তব্যের সঙ্গে যোগ করে বলা যায় যে বিকৃত বাংলা উচ্চারণের পেছনে আঞ্চলিক ভাষাপ্রীতি ও অজ্ঞানতাবোধও কম ক্রিয়াশীল নয়। এই প্রবন্ধের অংশবিশেষে শুদ্ধ উচ্চারণের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা তর্ক বহির্ভূত নয়। যেমন, একাত্তর পৃষ্ঠায় আছে শ্বেত (শেতো)। হীন (হিনো), এগার (এগারো)। 'এগার' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ এ্যাগারো এবং শ্বেত ও হীন শব্দ অন্য কোন শব্দের সংযুক্তি ছাড়া বানান অনুযায়ীই উচ্চারিত হয়ে থাকে। শ্বেতহস্তী বা হীন-মন্যতা শব্দে শ্বেত ও হীনের উচ্চারণ শেতো ও হিনো। ছন্দের প্রয়োজনে কবিতা ও গানে চিহ্ন শব্দ চিন্‌নোহ্ উচ্চারিত হতে পারে, তবে গদ্যে শব্দের শেষে হ বর্জন স্বাভাবিক। বিরাশি পৃষ্ঠায় আন্তর্জাতিক, আবশ্যক ও আহাম্মক শব্দের দ্বিরূপ উচ্চারণ দেখান হলেও 'আন্তর্জাতিক' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ আন্‌তোর্‌জাতিক—আন্‌তরজাতিক নয়।

'বাঙলা কবিতার ভাষা : প্রাচীন যুগ' প্রবন্ধে ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) পদগঠনরীতি (Morphology), এবং শব্দতত্ত্ব (Vocables) এই ত্রয়ী পরিভাষা ব্যবহৃত। ভাষাতত্ত্বে শেষোক্ত দুটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয় না (পৃ. ১৩৫)। তাছাড়া, Vocables অর্থে শব্দ গঠন বা শব্দরীতি (যদি এই পরিভাষার অর্থ শব্দ ও তার অর্থ) ব্যবহার অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। একই পৃষ্ঠায় লেখক মন্তব্য করেছেন 'চর্যাপদে স্বরধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণ সর্বত্র রক্ষিত হয়নি।' এই মন্তব্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তার কারণ, চর্যাপদগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত বলে উচ্চারণরীতির মধ্যে পার্থক্য স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, চর্যাপদের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অতীতে কী ছিল তা নির্ণয় অসাধ্য। কারণ চর্যাপদের অব্যব-হিত পরবর্তী সাহিত্যের নিদর্শন অনুপস্থিত। তৃতীয়ত, চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা—এই মত সর্বত্র গৃহীত নয়।

'বাঙলা নাটকের ভাষা' ও 'বাংলা প্রবন্ধের ভাষা : প্রস্তুতি পর্যায়' প্রবন্ধে নাটকের ভাষার উদ্দেশ্য ও রামমোহন রায়ের ভাষার মূল্যায়ন যথার্থ। 'বাঙলা উপন্যাসের ভাষা'য় প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষার সার্থকতা

ও ব্যর্থতা নির্দেশিত। তাঁর ভাষা নির্মাণে যে গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেই গ্রন্থের ভাষা-আলোচনায় প্যারীচাঁদের ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেত। গ্রন্থটি হল 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'। এই গ্রন্থটি সম্ভবত প্যারীচাঁদের সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গ্রন্থে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'বাঙলা ভাষায় প্রাণিবাচক শব্দ'। সম্ভবত তিনিই এই দিকটি সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করে ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের বৈচিত্র্য নির্দেশ করলেন। সুলিখিত এই প্রবন্ধটি বিষয় ও বস্তু-বিশ্লেষণে হৃদয়গ্রাহী।

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস যে-ভাবে কৌতূহলী গবেষকের মনন নিয়ে বাংলা ভাষার শব্দ, বানান, উচ্চারণ এবং গদ্য কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হওয়ায় প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি সচেতন ও সংস্কারহীন পাঠকের কৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—চিন্তা ও চেতনায়।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ